47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

# ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা সঙ্কট ঘনীভূত করছে

## আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটি গঠন করুন

প্রতি বছর অনেক ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ ভর্তি হতে পারে, আবার কেউ পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্সে পড়ার জন্য দেশে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এগুলোর অধীনে আর কিছু কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বর্তমানে একজন ছাত্র কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এই ভেবে বসে থাকতে পারে না যে, আমি তো এখানে টিকবই আবার অন্য জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দেব কেন। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীরা বসে না থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এহেন জনগোষ্ঠীর অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আনতে পারেন না। তাছাড়াও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ত ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে, অন্য আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ভর্তি শুরুই হয়নি। তার উপর যদি পরের

বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বেরটার তুলনায় সুযোগ-সুবিধা বেশি হয় তাহলে অনেক ছাত্র প্রথমটাতে ভর্তি হয়েও পরেরটাতে আবার পরীক্ষা দেয়। যারা টিকে যায় তারা আগের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসে। এতে আগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সিট খালি হয়ে যায়। পরে দেখা যায়, প্রায় ক্ষেত্রেই এসব খালি সিট খালিই থেকে যায়। এসব সমস্যা দূর করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী পন্থা হচ্ছে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটি গঠন করা। এ কমিটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন প্রশ্নমালা প্রণয়ন করবে এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সহায়তা করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করবে তারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা অনুসারে তাদের পছন্দের Subject ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে (যা অনেকটা বিআইটি ও মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)। এ নিয়ম চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন হয়রানির হাত থেকে নিস্তার পাবে তেমনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট খালি থেকে যাওয়ার সমস্যাও লাঘব হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**নাজমুল হক**
প্রযত্নে ঃ অধ্যাপক আবদুল হক
গ্রাম ঃ জগতপুর
ডাকঘর ঃ ফাজিলের ঘাট
থানা ঃ দাগনভূঞা, ফেনী-৩৯২০।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হোক

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আজও পরীক্ষার ফল নির্ধারণে 'নম্বর পদ্ধতি' রয়ে গেছে। অর্থাৎ কোন্ ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কত নম্বর পেল, তা যোগ করে যোগফল অনুযায়ী তাকে মূল্যায়িত করা হয়। কিন্তু শিক্ষকভেদে এমনকি একই শিক্ষকের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একই খাতার বিভিন্ন রকম মূল্যায়ন হতে পারে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মার্ক পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত এ ভিন্নতা একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ। অর্থাৎ, একটি খাতায় একজন শিক্ষক ৬৫ নম্বর দিলে অন্য একজন হয়ত ৬০, ৬৩, ৬৭ বা ৬৮ নম্বর দিতে পারেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বর ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যেই থাকবে। এটাই গ্রেডিং সিস্টেমের মূলনীতি। এই সিস্টেমে শিক্ষার্থীকে A গ্রেড দিলে বোঝা যাবে ঐ খাতার মূল্যমান ৬০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। প্রত্যেকটা গ্রেড-এর আবার পয়েন্ট বা ক্রেডিট থাকলে সম্মিলিত পয়েন্টের ভিত্তিতে তার গ্রেড নির্ণয় করা যাবে। উন্নত প্রায় সব দেশেই এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যে, খুব বেশি না শিখে পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর খুব ভালভাবে শিখে যাতে পরীক্ষার খাতায় ভালভাবে উপস্থাপন করা যায়। অর্থাৎ, জানার চাইতে খাতায় উপস্থাপনাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ শুধুমাত্র উপস্থাপনার গুণে বেশ কিছু মার্ক বেড়ে যেতে পারে এবং যায়ও। এই মার্কগুলো সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে অনেক জেনেও সামান্য উপস্থাপনার কারণে জ্ঞানী ছাত্র কম নম্বর পেয়ে কমপ্লেক্সে ভুগতে পারে। কিন্তু গ্রেডিং-ক্রেডিট সিস্টেমে এই সামান্য হেরফের কোন ভূমিকা পালন করবে না। ফলে ভাল ছাত্রদের জ্ঞানের মূল্যায়ন হবে। সেই সাথে এমনভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে যেন একজন ছাত্র তার পাঠ্যক্রমের সামান্যতম অংশও বাদ না দেবার সুযোগ পায়। মেধা তালিকা উঠিয়ে দিতে হবে। গ্রেডিং-ক্রেডিট পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দায়িত্বশীল 'জ্ঞানী' ও 'বিজ্ঞ' জনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

**খালেদ মোহাম্মদ আলী**
ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সালের স্নাতক (পাস) কোর্সের পরীক্ষা গত ২ অক্টোবর, '৯৩-তে শুরু হয় এবং পরীক্ষা শেষ হয় গত ১৬ নবেম্বর, '৯৪ তারিখে। পরীক্ষা শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত সময় তিন মাসের মধ্য পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা। কিন্তু বিগত বছরগুলোর পরীক্ষার ফল কখনোই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ ১৯৯২ সালের স্নাতক (পাস) কোর্সের পরীক্ষার ফলও দীর্ঘ আট মাস পর প্রকাশ করা হয়। এ ফল প্রকাশে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময়ের অপচয় হচ্ছে। উল্লেখ্য, সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শেষ হলে কখন ফল প্রকাশ করা হবে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় এ বছর যে পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে তারা সকলেই অনিয়মিত। সেহেতু এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কম। সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এ বছর স্নাতক (পাস) কোর্সের পরীক্ষার ফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব। কর্তৃপক্ষকে বলছি, আমাদের সময় আর অপচয় না করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করুন।

**অরুন কুমার দেবনাথ**
পাইকসা, ঘোড়াশাল
নরসিংদী।